ভারতের পারমানবিক উদ্যোগ - ১৯৪৭ থেকে ১৯৯০

প্রদীপ দত্ত

স্বাধীনতার আগে বিজ্ঞান গবেষণা মূলত ব্যক্তির আগ্রহের ওপর নির্ভর করতো। অর্থের যোগান ছিল অল্প, গবেষণা ছিল খোলামেলা। এই অবস্থাতেও বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের যথেষ্ট অবদান ছিল। ১৯৩০ সালে সি ভি রমন পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। ১৯৪১ সালে পরমাণু গবেষণার কাজে কোলকাতায় সাইক্লোট্রন যন্ত্র বসিয়েছিলেন মেঘনাদ সাহা। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যের দৌলতেই এইসব বিজ্ঞানীদের আবির্ভাব ঘটেছিল। অথচ আজ ভারতীয় বিজ্ঞান এত বেশি পারমাণবিক, সামরিক ও মহাকাশ গবেষণার দিকে ঝুঁকে রয়েছে যে বিজ্ঞান জগৎ এবং অপামর ভারতীয়ের জন্য তা তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারছে না।

ব্যবহারে পারদর্শী হয়ে ওঠা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেইমত ১৯৪৮ সালের ১০ অগস্ট ভারত সরকার অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন (AEC) গঠন করে। টাটা ইনস্টিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চের প্রতিষ্ঠাতা বিজ্ঞানী হোমি জাহাঙ্গীর ভাবাকে কমিশনের চেয়ারম্যান নির্বাচন করা হয়। ১৯৬৬ সালের ২৪শে জানুয়ারি, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ভাবা AEC-র চেয়ারম্যান ছিলেন।

স্বাধীনতার আগে জাতীয় কংগ্রেসে নেহেরুর বিজ্ঞান উপদেষ্টা ছিলেন মেঘনাদ সাহা। তিনি বুনিয়াদি বিজ্ঞান গবেষণাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করার বিরোধীতা করেছিলেন। স্বাধীন পরমাণু শক্তি সংস্থা গঠনেরও বিরোধী ছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নেহেরু তাঁর প্রাক্তন বিজ্ঞান উপদেষ্টার কথা কানেই তোলেন

দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে পরমাণু শক্তি এবং মহাকাশ গবেষণা ভোটের সময় ইমেজ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ১৯৭৪ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী উত্তর প্রদেশের নারোরায় পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কথা ঘোষণা করেন। সরকারের পরিবেশ বিভাগ অঞ্চলটির নির্বাচন সম্পর্কে প্রতিকূল রিপোর্ট পেশ করেছিল কিন্তু আসন্ন ভোটের কথা ভেবেই ইন্দিরা গান্ধী সেই রিপোর্ট মানেন নি। পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র ছিল উন্নয়নের প্রতীক।

পরমাণুর বিভাজন আবিস্কারের পর যে বিপুল কর্মযজ্ঞের ফলে বোমা উৎপাদিত হয়েছিল তা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মেল বন্ধন ঘটায়। ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রথম দশকে, ১৯৪৮ থেকে '৫৮ সালের মধ্যে নানা দেশ তা আয়ত্ব করতে উঠেপড়ে লেগেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় উন্নত দেশের শিল্প ও প্রযুক্তিতে যে ভিত গড়ে উঠেছিল তার ওপর দাঁড়িয়ে কয়েকটি দেশে পরমাণু প্রযুক্তির বিপুল অগ্রগতি ঘটে। সে সময় দু'শো বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে ভারতীয় নেতৃত্ব দেশ গড়ার কাজে মন দিয়েছিলেন। বিশ্বযুদ্ধের সময় পরমাণু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ভারতের অংশগ্রহন সম্ভব হয়নি বলে এই নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবস্থা আয়ত্বে আনার কোনও পরিকাঠামোই এদেশে ছিল না। কিন্তু বিজ্ঞানীমহলের মনে হয়েছিল যে পরমাণুকে শান্তির কাজে

নি। AEC গঠিত হলে নীতিগত কারণে মেঘনাদ সাহা এই প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত হন নি। তাঁর প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগে ভারতে বিজ্ঞান নীতি গৃহীত হয়।

বৈজ্ঞানিক পরামর্শের ক্ষেত্রে নেহেরু ভাবার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিলেন, সম্পর্কও ছিল ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ। একমাত্র ভাবাই নেহেরুকে 'ভাই' সম্বোধন করতেন। নেহেরুর সঙ্গে সুসম্পর্কের সুবাদে ভাবার নেতৃত্বে বিজ্ঞান নীতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে দাঁড়াল। বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা জনসাধারণকে কিংবা পার্লামেন্টে বিস্তারিত বলা হতো না। বেসরকারি বিজ্ঞানীদের তরফ থেকে কোনও সমালোচনা সরকার ভালো চোখে দেখতো না। AEC গঠিত হবার পর বিজ্ঞানের গবেষণা কলকাতা থেকে মুম্বাইয়ে স্থানান্তরিত হয়েছিল ১৯৫৮ সালে নেহেরুর সাথে পরামর্শ করে, ভাবা

আমেরিকার প্রতি তেমন নির্ভরশীলতাও ছিল না। সত্তরের দশকের শেষে ভারতে চালু এবং নির্মাণের কাজ চালু হয়েছে এমন চুল্লির মধ্যে ৫টি ছিল গবেষণা চুল্লি, ৭টি বাণিজ্যিক চুল্লি এবং ৩টি পুনঃশোধন কেন্দ্র। এরমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র কেবল তারাপুরের একটি চুল্লি সরবরাহ করেছিল। ১২টি চুল্লির কোনওটিতেই IAEA-র তদারকি ছিল না। আমেরিকার বক্তব্য ছিল, এই ১২টি চুল্লিতে যদি ভারত IAEA-র তদারকি চালু না করে তাহলে তারাপুরের চুল্লিটির জ্বালানি, কম সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম, সরবরাহ বন্ধ করে দেবে।'৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কানাডা একই নীতি গ্রহণ করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ব্রিটেন মার্কিন দাবি সমর্থন করেছিল। বৃহৎ শক্তির এই অবস্থানে ভারত বেকায়দায় পড়েছিল। প্রজনী চুল্লি প্রযুক্তির জন্য ভারত ফ্রান্সের ওপর নির্ভরশীল ছিল। থোরিয়াম নির্ভর প্রযুক্তি চালু করার জন্য পশ্চিম জার্মানী ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তিগত সাহায্য দরকার। ভারতে থোরিয়ামের বিপুল ভাণ্ডার রয়েছে বলে পরিকল্পনা করা হয়েছিল যে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন কর্মসূচির কেন্দ্রে থাকবে থোরিয়াম কনভার্টার বা প্রজনী চুল্লি প্রযুক্তি। এই অবস্থায় বিদেশী সাহায্য বন্ধ হলে খুবই বিপদ। অন্যদিকে ইউরেনিয়াম আমদানিরও প্রয়োজন। কারণ দেশে ইউরেনিয়ামের ভান্ডার অপ্রতুল। তা উত্তোলন ও প্রক্রিয়াকরণের ক্ষমতাও কম। কাজেই ইউরেনিয়াম রপ্তানিকারী দেশের সাহায্য পেতেই হবে। সেইসব দেশের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়া সবাই চাইত যে ভারতের পারমাণবিক কর্মসূচিতে IAEA-র নিয়ন্ত্রণ চালু হোক।

যুক্তরাষ্ট্রের কার্টার প্রশাসন চেয়েছিল ভারত যেন IAEA-র তদারকি ব্যবস্থা মেনে নেয়। তাহলেই প্লুটোনিয়াম উৎপাদন বন্ধ হবে। কিন্তু মোরারজী দেশাই সরকার পরমাণু কেন্দ্রগুলোকে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে আনতে রাজি হয়নি। পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগ থেকেই ভারত বলে এসেছে যে নতুন নতুন দেশের পরমাণু অস্ত্র উৎপাদন যদি ঠেকাতে হয় তাহলে বৃহৎ শক্তিকে এই অস্ত্র উৎপাদন বন্ধ করতে হবে। এবং তাদের চাপে যদি চিন এই চেষ্টা থেকে বিরত থাকে তাহলেই ভারত পরমাণু অস্ত্র তৈরির উদ্যোগ বন্ধ করবে। পরমাণু অস্ত্রে বলিয়ান বৃহৎ শক্তিধর দেশের পক্ষে নানা দেশের কাছে পরমাণু অস্ত্র তৈরি না করার কথা আদায় করা অনৈতিক ও সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টার অঙ্গ। পরমাণু অস্ত্রধর দেশ যদি সার্বিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি (CTBT) মেনে চলে, বিভাজনক্ষম পদার্থ উৎপাদন বন্ধ করে, অস্ত্র মুক্তির উদ্দেশ্যে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ নেয় সেক্ষেত্রে ভারত পারমাণবিক কর্মসূচির ওপর নিয়ন্ত্রণ মেনে নিতে পারে।

ভারত বরাবর বলে এসেছে যে NPT অস্ত্রহীনকে নিরস্ত্র করতে চেয়েছে, অস্ত্রধারীরা অস্ত্রসজ্জিত হয়েই চলেছে। NPT হরাইজন্টাল প্রলিফারেশন বন্ধ করবে ঠিকই কিন্তু তাতে ভার্টিকাল প্রলিফারেশন বন্ধ হবে না। যাদের পরমাণু অস্ত্র নেই তাদের পরমাণু অস্ত্র তৈরি করতে নিষেধ করা হচ্ছে। অথচ পরমাণু অস্ত্রধারী দেশগুলো এ বিষয়ে নির্দিষ্ট দায়িত্ব নিচ্ছে না। পরমাণু অস্ত্রহীন দেশের যাবতীয় পরমাণু কর্মসূচিতে নিয়ন্ত্রণ চালু করতে বলা হচ্ছে, অথচ পরমাণু অস্ত্রধর দেশের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ যদি আদৌ থাকে তাও তাদের ইচ্ছে মতো হতে হবে। তাই ভারত NPT মানে নি। যে সব দেশের পরমাণু অস্ত্র তৈরির ক্ষমতা একেবারেই নেই তারাই NPT মেনেছে। যে সব দেশ পরমাণু শক্তিধর দেশের মিত্র অর্থাৎ প্রতিরোধী পরমাণু অস্ত্রের ওপর নির্ভরশীল তারাও এই চুক্তি মেনেছে। কিন্তু পরমাণু অস্ত্র তৈরিতে সক্ষম নির্জোট কোনও দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি। তাই অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের মার্কিন প্রচেষ্টাকে ভারত মনে করেছিল, আলাপ আলোচনায় পেরে না উঠে জোড় খাটানোর চেষ্টা। পরমাণু শক্তিধর দেশগুলো নিজেদের অবস্থান না বদলালে ভারত তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে না বলে জানিয়েছিল। পরমাণু শক্তিধর দেশগুলোকে (ক) CTBT নিয়ে আলোচনা করতে হবে। (খ) পরমাণু অস্ত্র তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় পদার্থ উৎপাদন করা চলবে না এবং (গ) পরমাণু অস্ত্র থেকে সম্পূর্ণ মুক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের শর্তে রাজী হয়নি।

মোরারজী দেশাই ছিলেন NPT বিরোধী। তিনি অস্ত্র উৎপাদনে সক্ষম হয়ে ওঠার পক্ষে কথা বলতেন, যা তার পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এবং পরবর্তীকালে ইন্দিরা গান্ধীও সমর্থন করতেন। মোরারজী দেশাইয়ের আমলে বৈদেশিক বিষয়ক মন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী ছিলেন জনসংঘের প্রতিনিধি। জনসংঘ বরাবরই ছিল অস্ত্র উন্নয়নের

এমনভাবে AEC-র পুর্নগঠন করেন যাতে বিজ্ঞান পরিকল্পনা বাস্তাবায়নে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা পান। AEC-র চেয়ারম্যানকে যাবতীয় আর্থিক এবং পরিকল্পনা বাস্তাবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়। একই সাথে ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাটমিক এনার্জির (DAE বা পরমাণু শক্তি বিভাগ) সেক্রেটারি হিসাবে তাঁকেই নিয়োগ করা হয়। তিনি শুধু প্রধানমন্ত্রীর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য থাকবেন। ভাবাকে এমন ক্ষমতা দেওয়া হয় যাতে তিনি কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের মতামত অগ্রাহ্য করেও চলতে পারেন। AEC-কে নিজের নীতি ও কর্মপদ্ধতি রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয় ।

ভাবার নিজের অফিস থেকে প্রেরিত সরকারের এই নোটিশের মাধ্যমে তিনি দেশের সাংবিধানিক পরিকাঠামোর মধ্যেই সার্বিক স্বাধীনতা পেয়েছিলেন। AEC ও DAE-র সর্বময় কর্তা ছাড়াও তিনি গোড়া থেকেই টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ-এর (TIFR)-র অধিকর্তা ছিলেন। এই সংস্থার বাজেটের শতকরা ৯৯ শতাংশই জোগান দিত DAE। তবে সরকারি অর্থ সাহায্যের বিনিময়ে যাতে আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ না চেপে বসে সেদিকে ভাবার নজর ছিল।

AEC হল একটি সরকারি নীতি নির্ধারক সংস্থা আর DAE হল AEC-র নীতি বাস্তাবায়নের সরকারি সংস্থা। দুটি সংস্থাই পরমাণু শক্তিমন্ত্রকের অধীন। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীই পরমাণু শক্তিমন্ত্রী। এই অবস্থায় ভাবা যাবতীয় বৃহৎ বৈজ্ঞানিক গবেষণা DAE-র অধীনে নিয়ে আসেন। পরমাণু গবেষণার জন্য ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারি অনুদান দেওয়া হতো না। তাই বিদেশ থেকে তরুণ ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দেশে টেনে আনার মতো আকর্ষণ বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করতে পারে নি, DAE পেরেছিল। ভাবা মনে করতেন শিল্পে অনুন্নত দেশকে উন্নত করতে গেলে বড় বড় সংগঠন তৈরি করতে হবে। ভাবা নেহেরুকে শান্তিপূর্ণ পরমাণু শক্তির কূটনৈতিক ও সামরিক গুরুত্বের কথা বুঝিয়েছিলেন। নেহেরু কিন্তু পরমাণুর শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের কথাই বলতেন। ভাবার পরমাণু অস্ত্র বিরোধীতায় উৎসাহ ছিল না। পরমাণু অস্ত্র মুক্তির জন্য আন্তর্জাতিক পাগওয়াশ আন্দোলনে তিনি যুক্ত হতে রাজি হন নি। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ও বার্ট্রান্ড রাসেল-এর উদ্যোগে পরমাণু অস্ত্র বিরোধী ম্যানিফেস্টো তৈরি করার সময়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে রাসেল বলেছিলেন :

আমি আশা করেছিলাম যে এ বিষয়ে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের এবং ভারত সরকারের সাহায্য পাব। ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নেহেরু যখন লন্ডন ভ্রমনে এলেন তখনই সেই আশার পরিসমাপ্তি ঘটে। নেহেরুকে খুবই সহানুভূতিশীল মনে হয়েছিল। আমি তার সাথে মধ্যাহ্নভোজন সেরেছি, নানা মিটিং ও বরণ অনুষ্ঠানে গিয়েছি। তিনি খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ ছিলেন। কিন্তু তাঁর কর্মসূচির শেষ দিকে যখন ভারতের মুখ্য সরকারি বিজ্ঞানী ড. ভাবার সাথে দেখা হল অত্যন্ত শীতল ব্যবহার পেলাম। আমার মনে যে করফারেন্সের (পাগওয়াশ) কথা ছিল তাতো দূরস্থান, এই ধরণের ম্যানিফেস্টোতেই তাঁর খুব সন্দেহ ছিল। ভারতের সরকারি বিজ্ঞানী মহল থেকে আমি যে কোনও উৎসাহ পাব না তা আমার কাছে পরিস্কার হল।

অধ্যাপক ডি ডি কোসাম্বী পরমাণু গবেষণা ও উন্নয়নের বিপুল খরচ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, খোলামেলা ও অংশগ্রহণকারী ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন। তাই তাঁকে ১৯৬২ সালে TIFR থেকে বিতারিত করা হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে এক জাতীয় কমিটির উদ্যোগে ১৯৭০ সালে দেশে একটি বৈজ্ঞানিক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সভাপতিত্ব করেছিলেন অধ্যাপক বি ডি নাগচৌধুরী। উদ্দেশ্য ছিল ১৯৫৮ সালে গৃহীত বিজ্ঞান নীতির পর্যলোচনা করা। সেখানে বলা হয়েছিল যে '৫৮ সালে গৃহীত বিজ্ঞান নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ব্যর্থতা দেখা গেছে। প্রস্তাবের অনেক কথাই কাগজে-কলমে থেকে গেছে।

১৯৭৮ সালে প্রযুক্তির স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণার অবস্থা ক্ষতিয়ে দেখতে এক কমিটির পর্যালোচনায় বলা হয়েছিল যে শিক্ষা ব্যবস্থা ও গবেষণায় রাষ্ট্রের উদ্যোগ হতাশজনক। অধ্যাপক ওয়াই নয়ুদামার সভাপতিত্বে ওই কমিটি জানিয়েছিল যে আগেকার পর্যালোচনা কমিটির পরামর্শ মানা হয়নি, গবেষণা ও উন্নয়ন ঘটেছে অতি সামান্য। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উদ্যোগ ভারতীয় সমাজের কাজে লাগে নি। ১৯৮০

সালে ওই কমিটি সিদ্ধান্তে আসে যে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটানো এবং তা বজায় রাখার জন্য জোরদার উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন, দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং অন্যান্য সামাজিক প্রয়োজনের তুলনায় এই উদ্যোগে প্রয়োজনীয় মানুষের সংখ্যা খুবই কম। পৃথিবীর দশটি শিল্পোন্নত দেশের মধ্যে ভারত একটি, বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদের সংখ্যায় ভারত তৃতীয় বৃহৎ—এইসব যাবতীয় সরকারি দাবিকে ওই কমিটি প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। কমিটির মতে, প্রযুক্তিগতভাবে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা, শিক্ষার সুযোগ এবং প্রযুক্তির কতটা সুবিধা দেশ পাচ্ছে সেই হিসাব ধরলে সরকারি সাফল্যের দাবি মেনে নেওয়া যায় না। কমিটির মতামত সরকার এড়িয়ে গিয়েছিল। ততদিনে দেশে বৈজ্ঞানিক আমলাতন্ত্র জাঁকিয়ে বসেছিল।

১৯৭১ সালে কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধী সরকার গঠিত হওয়ার পর পরীক্ষামূলক পরমাণু বিস্ফোরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বোমার নকশা তৈরি হয়ে গেলেও দু-বছর লেগেছিল প্লুটোনিয়াম উৎপাদন ও আনুসঙ্গিক ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে। প্লুটোনিয়াম উৎপাদনের সিংহ ভাগ কাজ করেছিল BARC। হাই এক্সপ্লোসিভ লেন্স উন্নয়ন ও স্থাপনের কাজ করেছিল ডিফেন্স রিসার্চ এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (DRDO)। ১৯৭৪ সালে ভারত ভূ-গর্ভস্থ পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটায়। ভারতের দাবি ছিল, বিস্ফোরণের উদ্দেশ্য হল পারমাণবিক প্রযুক্তির পরীক্ষা, খনন কাজের প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নানা সুবিধার আশা এবং মাটির নীচে তেলের ভাণ্ডারে নাড়া দেওয়া, যাতে তা উৎপাদনের হার ও পরিমাণ—দুই-ই বাড়ে। সবাই কিন্তু বুঝেছিল ভারত পরমাণু অস্ত্র উৎপাদনের সক্ষমতাই পরীক্ষা করতে চায়। BARC-এর তদানিন্তন প্রধান, রাজা রামান্না, নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় জানিয়েছিলেন, পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষার ফলে তাঁর মর্যদা খুবই বেড়ে গিয়েছিল।

পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের জন্য প্রয়োজনীয় প্লুটোনিয়াম উৎপাদিত হয়েছিল BARC-এর গবেষণা চুল্লি সাইরাসে। ৪০ মেগাওয়াটের ওই চুল্লিটি সরবরাহ করেছিল কানাডা, চালু হয় ১৯৬০ সালে। চুল্লিটিতে বছরে ৯ থেকে ১০ কিলোগ্রাম প্লুটোনিয়াম উৎপাদিত হতো। কানাডার সঙ্গে চুক্তির শর্ত ছিল, চুল্লিটি শুধু শান্তিপূর্ণ কাজেই ব্যবহার করা যাবে। ভারত দাবি করে, সাইরাসে উৎপাদিত প্লুটোনিয়াম শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক বিস্ফোরণে ব্যবহার করা যাবে না এমন কোনও শর্ত ছিল না। ১৯৬৪ সালে চালু ট্রম্বের পুনঃশোধন কেন্দ্রে সাইরাসের নিঃশেষিত জ্বালানি থেকে রাসায়নিক উপায়ে প্লুটোনিয়াম নিঃষ্কাশন করা হতো। সাইরাসে IAEA অথবা কানাডা কারুরই তদারকি ছিল না। তাই কতটা প্লুটোনিয়াম উৎপাদিত হয়েছে তা গোপন ছিল।

দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে পরমাণু শক্তি এবং মহাকাশ গবেষণা ভোটের সময় ইমেজ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ১৯৭৪ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী উত্তর প্রদেশের নারোরায় পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কথা ঘোষণা করেন। সরকারের পরিবেশ বিভাগ অঞ্চলটির নির্বাচন সম্পর্কে প্রতিকূল রিপোর্ট পেশ করেছিল কিন্তু আসন্ন ভোটের কথা ভেবেই ইন্দিরা গান্ধী সেই রিপোর্ট মানেন নি। পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র ছিল উন্নয়নের প্রতীক।

এরইমধ্যে বিস্ফোরণ থেকে পাওয়া নানা তথ্যের সাহায্যে পরবর্তীকালে ভারত নিঃক্ষেপযোগ্য পরমাণু বোমা তৈরি করে। বোমার নকশায় পরিবর্তন ঘটিয়ে ছোট বোমা তৈরি করে তা বোমারু বিমান বা ক্ষেপণাস্ত্রে স্থাপন করে। অন্যদিকে প্লুটোনিয়াম ধাতুশোধন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ঘটিয়ে প্লুটোনিয়াম নিষ্কাশন করতে গিয়ে যতটা প্লুটোনিয়াম নষ্ট হয় তার পরিমাণ কমাতে এবং বাতিল প্লুটোনিয়াম পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়ে ওঠে। বিশুদ্ধ প্লুটোনিয়াম উৎপাদনও সম্ভব হয়, যার ফলে পরিকল্পনা অনুযায়ী অস্ত্র কাজ করবে এই প্রত্যয় জোরদার হয়। লোকচক্ষুর অন্তরালেই পরমাণু অস্ত্র গবেষণা ও উন্নয়নের কাজ চলেছে।

সাইরাসে উৎপাদিত প্লুটোনিয়াম পরমাণু বোমার জন্য ব্যবহার করা নিয়ে সমস্যা ছিলই। তাই ১৯৮৫ সালের ৮ অগস্ট ট্রম্বেতে ১০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন গবেষণা চুল্লি ধ্রুব চালু করা হয়। চুল্লিটি সাইরাসের অনুকরণে নির্মিত। এখানে বছরে ২০ থেকে ২৫ কিলোগ্রাম অস্ত্র উৎপাদনের উপযোগী প্লুটোনিয়াম উৎপাদিত হতো। ট্রম্বের বর্ধিত ক্ষমতাসম্পন্ন পুনঃশোধন কেন্দ্রে ওই প্লুটোনিয়াম নিঃষ্কাশন করা হতো। তবে নানা সমস্যা দেখা দেওয়ায় আশির দশকের শেষ ভাগের আগে ধ্রুব থেকে খুব বেশি প্লুটোনিয়াম পাওয়া যায়নি।

১৯৮৫-র শেষে অথবা ১৯৮৬-র গোড়ায় তারাপুরে

দ্বিতীয় একটি পুনঃশোধন কেন্দ্রে নিঃশেষিত জ্বালানি থেকে প্লুটোনিয়াম নিঃষ্কাশন শুরু করা হয়। সেখানে সাইরাস এবং IAEA-এর তদারকিতে থাকা অন্য বাণিজ্যিক পরমাণু চুল্লির নিঃশেষিত জ্বালানি থেকে প্লুটোনিয়াম নিঃষ্কাশন চালু হয়। সেখানে তদারকি বিহীন ম্যাড্রাস অ্যাটমিক পাওয়ার স্টেশন (MAPS)-এর নিঃশেষিত জ্বালানিরও প্রক্রিয়াকরণ করা হতো। বোঝা গিয়েছিল যে ভারত বাণিজ্যিক পরমাণু চুল্লি থেকেই পরমাণু বোমার উপযোগী প্লুটোনিয়াম উৎপাদন করতে পারে। নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় কলপক্কমে আরেকটি পুনঃশোধন কেন্দ্র নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। ডেভিড অলব্রাইট এবং মার্ক হিবস-এর মতে, ১৯৯১ সালের মধ্যে ভারতে প্রায় ২৯০ কিলোগ্রাম বোমা তৈরির উপযোগী প্লুটোনিয়াম মজুত হয়েছিল। তার এক তৃতীয়াংশ এসেছিল ধ্রুব থেকে , বাকিটা সাইরাস থেকে। তাঁদের হিসাব মতো ১৯৯৫ সালের শেষে চারশো কিলোগ্রাম প্লুটোনিয়াম মজুত হবার কথা। অতিরিক্ত প্লুটোনিয়ামের সবটাই এসেছিল ধ্রুব থেকে।

নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকেই পরমাণু চুল্লির জ্বালানি হিসাবে ইউরেনিয়াম-২৩৩ ব্যবহারের জন্য তোড়জোড় শুরু হয়েছিল। চুল্লির জ্বালানি হিসাবে থোরিয়াম এবং অথবা ইউরেনিয়াম-২৩৩ ব্যবহারের জন্য বিপুল উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রাকৃতিক থোরিয়ামকে বিকিরিত করে ইউরেনিয়াম-২৩৩ উৎপাদন করা হয়। সাইরাস, ধ্রুব ও MAPS চুল্লিতে থোরিয়ামকে বিকিরিত করে কয়েক কিলোগ্রাম ইউরেনিয়াম-২৩৩ উৎপাদিত হয়েছিল।

ভারতে তেমন উল্লেখযোগ্য ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্র নেই। অথচ ১৯৮৬ সালের নভেম্বর মাসে ঘোষণা করা হয়েছিল, ভারত যে কোনও মাত্রায় ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ করতে পারে। আশির দশকের মাঝামাঝি BARC-এ ১০০টি গ্যাস সেন্ট্রিফিউজ বিশিষ্ট এক ছোট সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্র চালু হয়েছিল। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি মহীশূরে আরেকটি ছোট সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্র চালু করা হয়। এই দুই কেন্দ্রে চুল্লির জ্বালানি হিসাবে বছরে কয়েকশো কিলোগ্রাম কম সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম অথবা কয়েক কিলোগ্রাম অস্ত্রপোযোগী বেশি সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম উৎপাদন করা যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতের সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি থার্মোনিউক্লিয়ার অস্ত্র (তাপকেন্দ্রকীয় বা হাইড্রোজেন বোমা) উৎপাদন পরিকল্পনার অঙ্গ। এই অস্ত্রের ক্ষমতা ডয়টরিয়াম এবং ট্রিটিয়াম বিভাজনের ওপর নির্ভরশীল হলেও পারমাণবিক বিভাজনের মাধ্যমেই সংযোজন শুরু হয়। প্রাথমিক বিস্ফোরণের জন্য ইউরেনিয়াম অথবা প্লুটোনিয়াম লাগে।

আশির দশকে BARC বিপুল পরিমাণ বিশুদ্ধ বেরিলিয়াম ধাতু আমদানি করেছিল। পরে ভারতেই বেরিলিয়াম উৎপাদন শুরু হয়। বেরিলিয়ামের সাহায্যে কম আয়তনের, হালকা এবং আধুনিক পরমাণু বোমা তৈরি করা সম্ভব। নিউট্রন প্রতিফলকের সাহায্যে (বেরিলিয়াম খুবই কার্যকরী প্রতিফলক) শৃঙ্খল বিক্রিয়া বজার রাখতে অথবা সংকট ভরের জন্য প্রয়োজনীয় বিভাজনক্ষম পদার্থের পরিমাণ কমিয়ে ফেলা যায়।

ভারতে ট্রিটিয়াম উৎপাদিত হচ্ছে। অর্থাৎ চাইলে ভারত ট্রিটিয়াম বুস্টেড বিভাজনক্ষম অস্ত্র উৎপাদন করতে পারে। তবে এই অস্ত্র নির্মাণ করতে গেলে পুরো দস্তুর পরীক্ষামূলক পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটানো দরকার। কয়েক গ্রাম ট্রিটিয়ামের সাথে যদি সম পরিমাণ ডয়টরিয়াম রাখা যায় তাহলে বিস্ফোরণের ক্ষমতা কয়েক গুণ বৃদ্ধি পায়। এই প্রক্রিয়ায় অস্ত্রের আয়তন ও ওজন কম করে ফেলা যায়।

হাইড্রোজেন বোমায় তাপকেন্দ্রকীয় জ্বালানি হিসাবে লিথিয়াম ডয়টেরাইড ব্যবহার করা হয়। ভারতের লিথিয়াম উৎপাদন ও বিশুদ্ধকরণ কর্মসূচি রয়েছে। ১৯৮৫ সালে পশ্চিম জার্মানীর গোয়েন্দা বিভাগের নথীতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর মাধ্যমে BARC-কে তাপকেন্দ্রকীয় অস্ত্র উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, পাকিস্তান পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটালে যেন দু-মাসের মধ্যে ভারত তাপকেন্দ্রকীয় বোমার বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। অস্ত্র উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে পরমাণু অস্ত্রবহনযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র উন্নয়নের কাজও ভারত সমানতালে চালিয়েছে।

প্রথম পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের সময় ও তারপরে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিল অতি দুর্বল। ভারতের পারমাণবিক কর্মসূচির জন্য

আমেরিকার প্রতি তেমন নির্ভরশীলতাও ছিল না। সত্তরের দশকের শেষে ভারতে চালু এবং নির্মাণের কাজ চালু হয়েছে এমন চুল্লির মধ্যে ৫টি ছিল গবেষণা চুল্লি, ৭টি বাণিজ্যিক চুল্লি এবং ৩টি পুনঃশোধন কেন্দ্র। এরমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র কেবল তারাপুরের একটি চুল্লি সরবরাহ করেছিল। ১২টি চুল্লির কোনওটিতেই IAEA-র তদারকি ছিল না। আমেরিকার বক্তব্য ছিল, এই ১২টি চুল্লিতে যদি ভারত IAEA-র তদারকি চালু না করে তাহলে তারাপুরের চুল্লিটির জ্বালানি, কম সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম, সরবরাহ বন্ধ করে দেবে।'৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কানাডা একই নীতি গ্রহণ করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ব্রিটেন মার্কিন দাবি সমর্থন করেছিল। বৃহৎ শক্তির এই অবস্থানে ভারত বেকায়দায় পড়েছিল। প্রজনী চুল্লি প্রযুক্তির জন্য ভারত ফ্রান্সের ওপর নির্ভরশীল ছিল। থোরিয়াম নির্ভর প্রযুক্তি চালু করার জন্য পশ্চিম জার্মানী ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তিগত সাহায্য দরকার। ভারতে থোরিয়ামের বিপুল ভাণ্ডার রয়েছে বলে পরিকল্পনা করা হয়েছিল যে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন কর্মসূচির কেন্দ্রে থাকবে থোরিয়াম কনভার্টার বা প্রজনী চুল্লি প্রযুক্তি। এই অবস্থায় বিদেশী সাহায্য বন্ধ হলে খুবই বিপদ। অন্যদিকে ইউরেনিয়াম আমদানিরও প্রয়োজন। কারণ দেশে ইউরেনিয়ামের ভান্ডার অপ্রতুল। তা উত্তোলন ও প্রক্রিয়াকরণের ক্ষমতাও কম। কাজেই ইউরেনিয়াম রপ্তানিকারী দেশের সাহায্য পেতেই হবে। সেইসব দেশের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়া সবাই চাইত যে ভারতের পারমাণবিক কর্মসূচিতে IAEA-র নিয়ন্ত্রণ চালু হোক।

যুক্তরাষ্ট্রের কার্টার প্রশাসন চেয়েছিল ভারত যেন IAEA-র তদারকি ব্যবস্থা মেনে নেয়। তাহলেই প্লুটোনিয়াম উৎপাদন বন্ধ হবে। কিন্তু মোরারজী দেশাই সরকার পরমাণু কেন্দ্রগুলোকে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে আনতে রাজি হয়নি। পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগ থেকেই ভারত বলে এসেছে যে নতুন নতুন দেশের পরমাণু অস্ত্র উৎপাদন যদি ঠেকাতে হয় তাহলে বৃহৎ শক্তিকে এই অস্ত্র উৎপাদন বন্ধ করতে হবে। এবং তাদের চাপে যদি চিন এই চেষ্টা থেকে বিরত থাকে তাহলেই ভারত পরমাণু অস্ত্র তৈরির উদ্যোগ বন্ধ করবে। পরমাণু অস্ত্রে বলিয়ান বৃহৎ শক্তিধর দেশের পক্ষে নানা দেশের কাছে পরমাণু অস্ত্র তৈরি না করার কথা আদায় করা অনৈতিক ও সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টার অঙ্গ। পরমাণু অস্ত্রধর দেশ যদি সার্বিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি (CTBT) মেনে চলে, বিভাজনক্ষম পদার্থ উৎপাদন বন্ধ করে, অস্ত্র মুক্তির উদ্দেশ্যে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ নেয় সেক্ষেত্রে ভারত পারমাণবিক কর্মসূচির ওপর নিয়ন্ত্রণ মেনে নিতে পারে।

ভারত বরাবর বলে এসেছে যে NPT অস্ত্রহীনকে নিরস্ত্র করতে চেয়েছে, অস্ত্রধারীরা অস্ত্রসজ্জিত হয়েই চলেছে। NPT হরাইজন্টাল প্রলিফারেশন বন্ধ করবে ঠিকই কিন্তু তাতে ভার্টিকাল প্রলিফারেশন বন্ধ হবে না। যাদের পরমাণু অস্ত্র নেই তাদের পরমাণু অস্ত্র তৈরি করতে নিষেধ করা হচ্ছে। অথচ পরমাণু অস্ত্রধারী দেশগুলো এ বিষয়ে নির্দিষ্ট দায়িত্ব নিচ্ছে না। পরমাণু অস্ত্রহীন দেশের যাবতীয় পরমাণু কর্মসূচিতে নিয়ন্ত্রণ চালু করতে বলা হচ্ছে, অথচ পরমাণু অস্ত্রধর দেশের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ যদি আদৌ থাকে তাও তাদের ইচ্ছে মতো হতে হবে। তাই ভারত NPT মানে নি। যে সব দেশের পরমাণু অস্ত্র তৈরির ক্ষমতা একেবারেই নেই তারাই NPT মেনেছে। যে সব দেশ পরমাণু শক্তিধর দেশের মিত্র অর্থাৎ প্রতিরোধী পরমাণু অস্ত্রের ওপর নির্ভরশীল তারাও এই চুক্তি মেনেছে। কিন্তু পরমাণু অস্ত্র তৈরিতে সক্ষম নির্জোট কোনও দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি। তাই অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের মার্কিন প্রচেষ্টাকে ভারত মনে করেছিল, আলাপ আলোচনায় পেরে না উঠে জোড় খাটানোর চেষ্টা। পরমাণু শক্তিধর দেশগুলো নিজেদের অবস্থান না বদলালে ভারত তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে না বলে জানিয়েছিল। পরমাণু শক্তিধর দেশগুলোকে (ক) CTBT নিয়ে আলোচনা করতে হবে। (খ) পরমাণু অস্ত্র তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় পদার্থ উৎপাদন করা চলবে না এবং (গ) পরমাণু অস্ত্র থেকে সম্পূর্ণ মুক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের শর্তে রাজী হয়নি।

মোরারজী দেশাই ছিলেন NPT বিরোধী। তিনি অস্ত্র উৎপাদনে সক্ষম হয়ে ওঠার পক্ষে কথা বলতেন, যা তার পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এবং পরবর্তীকালে ইন্দিরা গান্ধীও সমর্থন করতেন। মোরারজী দেশাইয়ের আমলে বৈদেশিক বিষয়ক মন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী ছিলেন জনসংঘের প্রতিনিধি। জনসংঘ বরাবরই ছিল অস্ত্র উন্নয়নের

পক্ষে। দেশাইয়ের শীর্ষ জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা কে শুব্রমনিয়ামও ভারতীয় পরমাণু বোমার পক্ষে বলতেন।

ভারত নানা সময়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে পরমাণু অস্ত্র তৈরি করা শুধু সিদ্ধান্ত নেবার অপেক্ষায়। ১৯৯০ সালে AEC-র চেয়ারম্যান পি কে আয়েঙ্গার জানিয়েছিলেন, কতটুকু সময়ের মধ্যে আমরা তা তৈরি করবো তা নির্ভর করছে হাতে কতটা সময় পাচ্ছি তার ওপর। পরমাণু অস্ত্র তৈরি করার ক্ষমতা যে ভারতের রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র তা জানত। ১৯৯২ সালের জানুয়ারি মাসে CIA-র অধিকর্তা রবার্ট গেট্স কংগ্রেসের এক কমিটিকে জানিয়েছিলেন যে অচিরেই ভারত পরমাণু বোমা তৈরি করে ফেলতে পারে। যুদ্ধ বিমানের রদবদল ঘটিয়ে পরমাণু বোমা নিক্ষেপও করতে পারে। পরীক্ষামূলক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপনের পর বোঝা গেছে যে কিছুদিনের মধ্যেই ভারত চিনের দিকে তাক করে পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্র সাজিয়ে রাখবে।

আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সেনা সরিয়ে নেওয়া ও ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানের পর দক্ষিণ এশিয়ার পারমাণবিক সংকট নিয়ে আমেরিকা বেশি করে মাথা ঘামাতে শুরু করে। যাতে দক্ষিণ এশিয়া পরমাণু অস্ত্রমুক্ত অঞ্চল হিসাবে গড়ে ওঠে সেই উদ্দেশে ১৯৯১-এর শেষে ভারত, পাকিস্তান, চিন ও রাশিয়াকে নিয়ে আলোচনায় উদ্যোগি হয়। ততদিনে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর ভারতের পাশে ছিল না। আর্থিকভাবে বিপন্ন বলে আমেরিকা ও পশ্চিমী দেশের সাথে ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা দরকার। কিন্তু তারপরও NPT-তে স্বাক্ষর করবে না বলে জানিয়েছিল এবং গুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক কেন্দ্রে নজরদারি ব্যবস্থা মেনে নেওয়ার বিনিময়ে আর্থিক সাহায্যের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা সুসম্পর্কের সুবাদে উপসাগরীয় যুদ্ধে ব্যবহৃত মার্কিন যুদ্ধ সরঞ্জামসহ অন্যান্য সামগ্রী কিনতে চেয়েছিল। ১৯৯২ সালের মে মাসে ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার, পর যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মন কষাকষির সময়েও দুই দেশের মধ্যে এইসব ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা হয়েছে। তার কয়েক সপ্তাহ আগে রাশিয়া ভারতকে ক্রায়োজেনিক রকেট (তরল জ্বালানি বিশিষ্ট) বিক্রির পরিকল্পনা করছে জানতে পেরে যুক্তরাষ্ট্র ভারত ও রাশিয়ার মহাকাশ বিভাগকে রকেট প্রযুক্তি বিক্রিতে দু-বছরের নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। যুক্তরাষ্ট্র মনে করে, রকেট আমদানির মাধ্যমে ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি উপকৃত হবে। দক্ষিণ এশিয়ায় পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতা কিভাবে বন্ধ করা যায় তা নিয়ে যখন ভারত ও আমেরিকার আলোচনা চলছে, ভারত কিন্তু পরমাণু অস্ত্র তৈরির কাজ চালিয়েই যাচ্ছিল।

Bertrand Russel, The Autobiograpy of Bertrand Russel, Vol-III, (London : Allen & Unwin 1969 ed.) P. 80
William Sweet, The US-India Safeguards Dispute, The Bulletin of the Atomic Scientists, June, 1978
Dhirendra Sharma, India's Lopsided Science, The Bulletin of the Atomic Scientists, May, 1991
David Albright and Mark Hibbs, India's Silent Bomb, The Bulletin of the Atomic Scientists, Sept., 1992